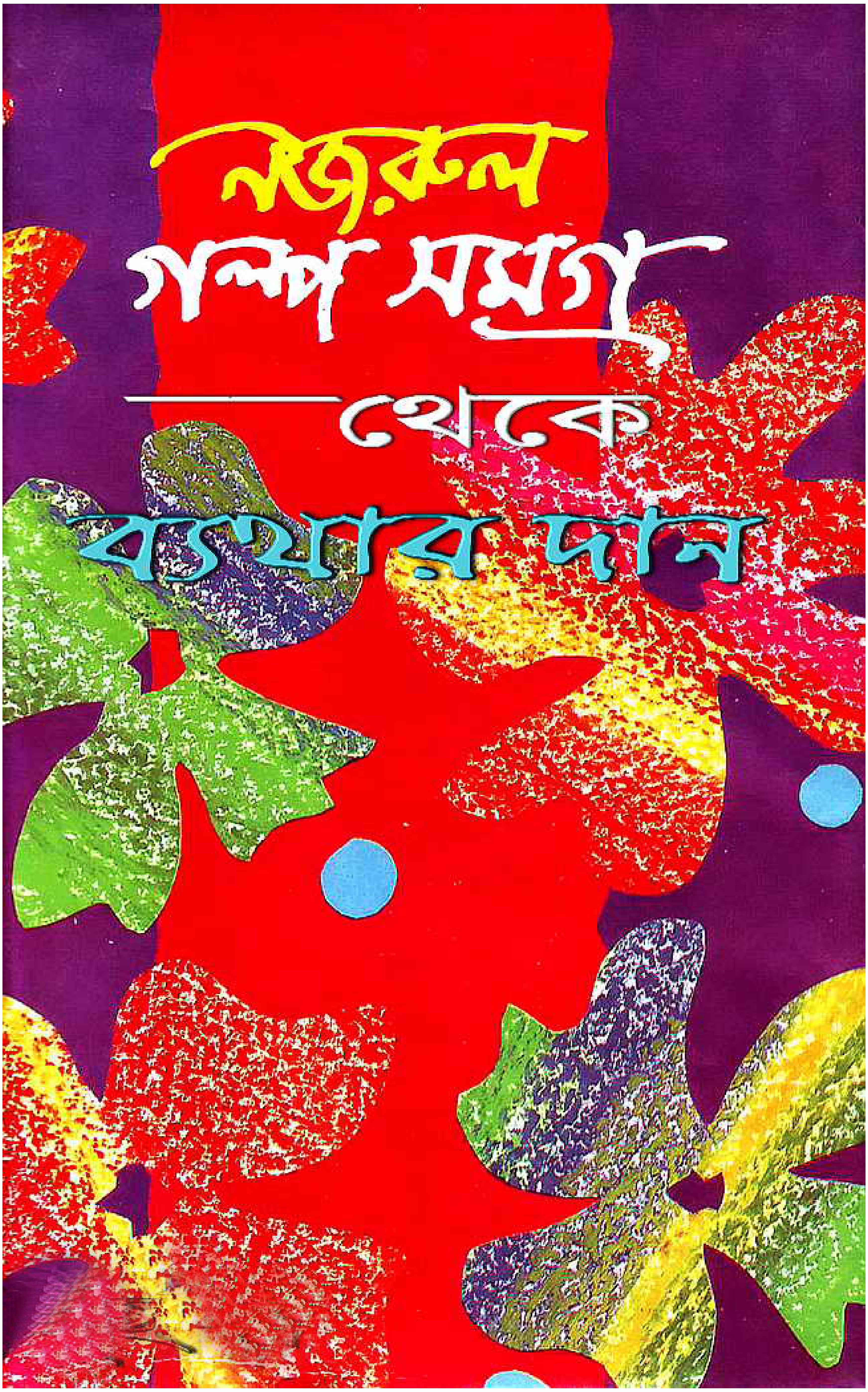
নজরুল
গল্প সমগ্র
থেকে
ব্যথার দান

দারার কথা

গোলেস্তান

গোলেস্তান! অনেক দিন পরে তোমার বুকে ফিরে এসেছি! আঃ, মাটির মা আমার, কত ঠান্ডা তোমার কোল! আজ শূন্য আঙিনায় দাঁড়িয়ে প্রথমেই আমার মনে পড়ছে জননীর সেই স্নেহ-বিজড়িত চুম্বন আর অফুরন্ত অমূলক আশঙ্কা, আমায় নিয়ে তাঁর সেই ক্ষুধিত স্নেহের ব্যাকুল বেদনা,.......সেই ঘুমপাড়ানোর সরল ছড়া, —

'ঘুম-পাড়ানি মাসি-পিসি ঘুম দিয়ে যেয়ো,
বাটা ভ'রে পান দেবো গাল ভ'রে খেয়ো!'

আরও ম'নে প'ড়ছে আমাদের মা-ছেলের শত অকারণ আদর-আব্দার।...সে মা আজ কোথায়?

দু'একদিন ভাবি, হয়তো মায়ের এই অন্ধ স্নেহটাই আমাকে আমার এই বড়-মা দেশটাকে চিনতে দেয়নি। বেহেশ্‌ত্ থেকে আবদেরে ছেলের কান্না মা শুনতে পাচ্ছেন কি-না জানি নে, কিন্তু এ আমি নিশ্চয় ক'রে ব'লতে পারি যে, মাকে হারিয়েছি ব'লেই—মাতৃ-স্নেহের ঐ মস্ত শিকলটা আপনা হ'তে ছিঁড়ে গিয়েছে ব'লেই আজ মা'র চেয়েও মহীয়সী আমার জন্মভূমিকে চিনতে পেরেছি। তবে এও আমাকে স্বীকার ক'রতে হবে,—মা'কে আগে আমার প্রাণ-ভরা-শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালবাসা অন্তরের অন্তর থেকে দিয়েই আজ মা'র চেয়েও বড় জন্মভূমিকে ভালবাসতে শিখেছি। মা'কে আমি ছোট ক'রছিনে। ধ'রতে গেলে মাই বড়। ভালবাসতে শিখিয়েছেন তো মা। আমার প্রাণে স্নেহের সুরধুনী বইয়েছেন তো মা! আমাকে কাজে অকাজে এমন ক'রে সাড়া দিতে শিখিয়েছেন যে মা! মা পথ দেখিয়েছেন, আর আমি চ'লেছি সেই পথ ধ'রে। লোকে ভাবছে, কি খামখেয়ালী পাগল আমি! কি কাঁটা-ভরা ধ্বংসের পথে চ'লেছি আমি! কিন্তু আমার চলার খবর মা জানতেন, আজ সে-কথা শুধু আমি জানি।

আমায় লোকে ঘৃণা ক'রছে? আহা, আমি ঐ তো চাই। তবে একটা দিন আসবেই যে দিন লোকে আমার সঠিক খবর জানতে পেয়ে দু'-ফোঁটা সমবেদনার অশ্রু ফেল্‌বেই ফেলবে। কিন্তু আমি হয়তো তা আর দেখতে পাব না। আর তা দেখে অভিমানী স্নেহ-বঞ্চিতের মতো আমার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না আসবে না। সে দিন হয়তো আমি থাকব দুঃখ-কান্নার সুদূর পারে।

আচ্ছা মা! তুমি তো ম'রে শান্তি পেয়েছ, কিন্তু এ কি অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে গেলে আমার প্রাণে? আমি চিরদিনই ব'লেছি না — না — না, আমি এ-পাপের বোঝা বইতে পারব না; কিন্তু তা তুমি শুনলে কই? সে-কথা শুধু হেসেই উড়িয়ে দিলে, যেন আমার মনের কথা সব জান আর কি...! এই যে বেদৌরাকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গেলে, এর জন্য দায়ী কে? এখন যে আমার সকল কাজেই বাধা! কোথাও পালিয়েও টিকতে পারছি নে। ......আমি আজ বুঝতে পারছি মা, যে, আমার এই ঘর-ছাড়া উদাস মনটার স্থিতির জন্যেই তোমার চির-বিদায়ের দিনে এই পুষ্প-শিকলটা নিজের হাতে আমায় পরিয়ে গিয়েছ। ঐ মালাই তো হ'য়েছে আমার জ্বালা! লোহার শিকল ছিন্ন ক'রবার ক্ষমতা আমার আছে, কিন্তু ফুলের শিকল দ'লে যাবার মতো নির্মম শক্তি তো নেই আমার ।.. যা কঠোর, তার ওপর কঠোরতা সহজেই আসে, কিন্তু যা কোমল পেলব নমনীয়, তাকে আঘাত ক'রবে কে? তারই আঘাত যে আর সইতে পারছি নে!

হতভাগিনী বেদৌরা! সে-কথা কি মনে পড়ে — সেই মায়ের শেষ দিন? — সেই নিদারুণ দিনটা? মায়ের শিয়রে মরণের দূত ম্লান মুখে অপেক্ষা ক'রছে — বেদনাপ্লুত তাঁর মুখে একটা নির্বিকার তৃপ্তির আবছায়া ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে, — জীবনের শেষ রুধিরটুকু অশ্রু হ'য়ে তোমার আর আমার মঙ্গলেচ্ছায় আমাদেরই আনত শিরে চুঁইয়ে প'ড়ছে মার পূত সে শেষের অশ্রু বেদনায় যেমন উত্তপ্ত, শান্ত স্নেহ-ভরা আশিসে তেমনই স্নিগ্ধ-শীতল। তোমার অযতনে — খোওয়া কালো কোঁকড়ান কেশের রাশ আমাকে শুদ্ধ ঝেঁপে দিয়েছে, আর তার অনেকগুলো আমাদেরই অশ্রু–জলে সিক্ত হ'য়ে আমার হাতে গলায় জড়িয়ে গিয়েছে, — আমার হাতের ওপর কচি পাতার মত তোমার কোমল হাত দুটি থুয়ে মা অশ্রু–জড়িত কণ্ঠে আদেশ ক'রছেন, — "দারা, প্রতিজ্ঞা কর-বেদৌরাকে কখনো ছাড়বি নে।"

তার পর তাঁর শেষের কথাগুলো আরও জড়িয়ে ভারী হ'য়ে এল, — "এর আর কেউ নেই যে বাপ, "এই অনাথা মেয়েটাকে যে আমি এত আদুরে আর অভিমানী ক'রে ফেলেছি।"

সে কি ব্যথিত-ব্যাকুল আদেশ, গভীর স্নেহের সে কি নিশ্চিন্ত নির্ভরতা!

তার প'রে মনে পড়ে বেদৌরা, আমাদের সেই কিশোর মর্মতলে একটু একটু ক'রে ভালবাসার গভীর দাগ, গাঢ় অরুণিমা।...মুখোমুখি ব'সে থেকেও হৃদয়ের সেই আকুল কান্না,মনে পড়ে কি সে–সব বেদৌরা? তখন আপনি মনে হ'ত, এই পাওয়ার ব্যথাটাই হ'চ্ছে সবচেয়ে অরুন্তুদ! তা না হ'লে সাঁঝের মৌন আকাশ–তলে দু–জনে যখন গোলেস্তানের আঙুর–বাগিচায় গিয়ে হাসতে হাসতে ব'সতাম, তখন কেন আমাদের মুখের হাসি এক নিমিষে শুকিয়ে গিয়ে দুইটি প্রাণ গভীর পবিত্র নীরবতায় ভ'রে উঠতো? তখনও কেন অবুঝ বেদনায় আমাদের বুক মুহুর্মুহু কেঁপে উঠতো? আঁখির পাতায় পাতায় অশ্রু শীকর ঘনিয়ে আসতো?..

আজ সেটা খুব বেশি ক'রেই বুঝতে পেরেছি বেদৌরা! কেননা, এই যে জীবনের অনেকগুলো দিন তোমার বিরহে কেটে গেল, তাতে তোমাকে না হারিয়ে আরও বড় ক'রে পেয়েছি। তোমায় যে আমি হারিয়েছিলাম, সে তোমাকে এত সহজে পেয়েছিলাম ব'লেই। বিরহের ব্যথায় জানটা যখন পিয়া পিয়া ব'লে 'ফরিয়াদ' ক'রে মরে, তখনকার আনন্দটা এত তীব্র যে, তা একমাত্র বিরহীর বুকই বোঝে, তা প্রকাশ ক'রতে আর কেউ কখনো পারবে না। দুনিয়ার যত রকম আনন্দ আছে, তার মধ্যে এই বিচ্ছেদের ব্যথাটাই হ'চ্ছে সবচেয়ে বেশি আনন্দময়!

আর সেই দিনের কথাটা? সে দিন বাস্তবিকই সেটা বড় আঘাতের মতই প্রাণে বেজেছিল। আমার আজও মনে প'ড়েছে, সে-দিন ফাগুন আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে আকাশে-বাতাসে ফলে-ফুলে-পাতায়!.... আর সবচেয়ে বেশি ক'রে তরুণ-তরুণীদের বুকে!

আঙুরের ডাঁশা থোকাগুলো রসে আর লাবণ্যে ঢল্-ঢল্ ক'রেছে পরীস্তানের নিটোল-স্বাস্থ্য ষোড়শী বাদশাজাদীর মত। নাশপাতি-গুলো রাঙিয়ে উঠেছে সুন্দরীদের শরম-রঞ্জিত হিঙুল গালের মত। রস-প্রাচুর্যের প্রভাবে ডালিমের দানাগুলো ফেটে ফেটে বেরিয়েছে কিশোরীদের অভিমানে স্ফুরিত টুক্‌টুকে অরুণ অধরের মত। পেস্তার পুষ্পিত ক্ষেতে বুল্‌বুল্‌দের নওরোজের মেলা ব'সেছে। আড়ালে-আগডালে বসে কোয়েল আর দোয়েল বধূর গলা-সাধার ধূম প'ড়ে গিয়েছে, কি ক'রে তারা ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে তাদের তরুণ স্বামীদের মশগুল ক'রে রাখবে,... উদ্দাম দখিন হাওয়ার সাথে ভেসে-আসা একরাশ খোশ্‌বু'র মাদকতায় আর নেশায় আমার বুকে তুমি ঢ'লে পড়েছিলে। শিরাজ্-বুল্‌বুল্ এর দিওয়ান পাশে থুয়ে আমি তোমার অবাধ্য দুষ্টু এলো চুলগুলি সংযত ক'রে দিচ্ছিলাম, আর আমাদের দু'জনারই চোখ ছেপে অশ্রু ব'য়েই চ'লেছিল।

মিলনের মধুর অতৃপ্তি এই রকম বড় সুন্দর হ'য়েই আমাদের জীবনের প্রথম অধ্যায়ের পাতাগুলো উল্টে দিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় সব ওলট-পালট হ'য়ে গেল, ঠিক যেমন বিরাট্ বিপুল এক ঝঞ্ঝার অত্যাচারে একটা খোলা বই-এর পাতা বিশৃঙ্খল হ'য়ে যায়! ....সে এলোমেলো পাতাগুলো আবার গুছিয়ে নিতে কি বেগই না পেতে হ'য়েছে আমায়, বেদৌরা!....তা হোক্ , তবু তো এই 'চমনে' এসে তোমায় ফের পেয়েছি। তুমি যে আমারই! বাঙালী কবির গানের একটা চরণ মনে প'ড়ছে, —

'তুমি' আমারি যে তুমি আমারি,
মম বিজন— জীবন-বিহারী!'

তারপর সেই ছাড়াছাড়ির ক্ষণটা বেদৌরা, তা কি মনে প'ড়ছে? আমি শিরাজের বুল্‌বুলের সেই গানটা আবৃত্তি ক'রছিলাম —

দেখ্‌নু সে-দিন ফুল বাগিচায় ফাগুন মাসের ঊষায়,
সদ্য-ফোটা পদ্ম ফুলের লুটিয়ে পরাগ-ভূষায়,

কাঁদছে ভ্রমর আপন মনে অঝোর নয়নে সে,
হঠাৎ আমার প'ড়ল বাধা কুসুম চয়নে যে!
কইনু,— "হাঁ ভাই ভ্রমর! তুমি কাঁদছ সে কোন্ দুখে
পেয়েও আজি তোমার প্রিয়া কমল কলির বুকে?"
রাঙিয়ে তুলে কমল-বালায় অশ্রু— ভরা চুমোয়
ব'ললে ভ্রমর—'ওগো কবি, এই তো কাঁদার সময়!
বাঞ্ছিতারে পেয়েই তো আজ এত দিনের পরে,
ব্যথা-ভরা মিলন-সুখে অঝোর ঝরা ঝরে!"

এমন সময় তোমার মামা এসে তোমায় জোর ক'রে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল; আমার একটা কথাও বিশ্বাস ক'রলে না। শুধু একটা উপেক্ষার হাসি হেসে জানিয়ে দিলে যে, সে থাকতে আমার মত একটা ঘর বাড়ি-ছাড়া বয়াটে ছোকরার সঙ্গে বেদৌরার মিলন হ'তেই পারে না!

আমার কান্না দেখে সে ব'ললে যে, ইরানের পাগলা কবিদের 'দিওয়ান' পড়ে পড়ে আমিও পাগলা হ'য়ে গিয়ে'ছি। তোমার মিনতি দেখে সে ব'ললে যে, আমি তোমাকে যাদু ক'রেছি।

তার পর অনেক দিন ঘুরে ঘুরে কেটে গেল ঐ ব্যাকুল-গতি ঝর্ণাটার ধারে। যখন চেতন হ'ল, তখনও বসন্ত-উৎসব তেমনি চ'লেছে, শুধু তুমিই নেই! দেখলুম, ক্রমেই তোমার আল্তা—ছোল্পানো পায়ের পাতার পাতলা দাগগুলো নির্ঝরের কূলে কূলে মিশিয়ে আসছে, আর রেশমি চুড়ির ভাঙা টুকরোগুলো বালি-ঢাকা পড়ছে।

আমি কখনো মনের ভুলে এ-পারে দাঁড়িয়ে—ডাকতুম,—বেদৌরা! অনেকক্ষণ পরে পাথরের পাহাড়টা ডিঙিয়ে ও-পার হ'তে কার একটা কান্না আসতে আসতে মাঝ-পথেই মিশিয়ে যেত,—রা—আঃ—আঃ!"

সারা বেলুচিস্তান আর আফগানিস্থানের পাহাড় জঙ্গলগুলোকে খুঁজে পেলুম, কিন্তু তোমার ঝরণা-পারের কুটিরটির খোঁজ পেলুম না।

একদিন সকালে দেখলুম, খুব উন্মুক্ত একটা ময়দানে একজন পাগলা একা আস্‌মান-মুখো হ'য়ে শুধু লাফ মারছে, আর সেই সঙ্গে হাত দুটো মুঠো ক'রে কিছু ধরবার চেষ্টা ক'রছে। আমার বড্ডো হাসি পেল। শেষে ব'ললাম, —হাঁ ভাই, উৎরিঙ্গে! তুমি কি তিড়িং তিড়িং করে লাফিয়ে আকাশ-ফড়িং ধ'রছ? সে আরও লাফাতে লাফাতে সুর ক'রে বলতে লাগল,—

"এ পার থেকে মারলাম ছুরি লাগল কলা গাছে,
হাঁটু বেয়ে রক্ত পড়ে চোখ গেল রে বাবা!"

এতে যে মরা মানুষেরও হাসি পায়! অত দুঃখেও আমি হো-হো- করে হেসে বললুম,-'ভাই, তুমি কি কবি?'

সে খুব খুশী হয়ে চুল দুলিয়ে বললে,—"হাঁ হাঁ, তাই।"

আমি ব'ললুম—"তা তোমার কবিতার মিল হল কই?"

সে বললে,—"তা নাই বা হ'ল, হাঁটু দিয়ে তোর রক্ত পড়ল তো। "

এই ব'লেই সে আমার নবোদ্ভিন্ন শ্মশ্রুমণ্ডিত গালে চুম্বনের চোটে আমায় বিব্রত ক'রে তুলে ব'ললে,— 'অনিলের নীল রংটাকে সুনীল আকাশ ভেবে ধ'রতে গেলে সে দূরে স'রে গিয়ে বলে,— "ওগো, আমি আকাশ নই, আমি বাতাস-আমি শূন্য, আমায় ধরা যায় না। আমায় তোমরা পেয়েছ। তবুও যে পাই নি বলে ধরতে আস, সেটা তোমার জবর ভুল।"

এক নিমিষে আমার মুখের মুখর হাসি মূক হয়ে মিলিয়ে গেল। ভাবলাম, হাঁ, ঠিকই তো। যাকে ভিতরে, অন্তরে পেয়েছি, তাকে খামখা বাইরের পাওয়া পেতে এত বাড়াবাড়ি কেন? তাই সে-দিন আমার পোড়ো বাড়িতে শেষ কান্না কেঁদে ব'ললুম, —"বেদৌরা! তোমায় আমি পেয়েছি আমার হৃদয়ে-আমার বুকের প্রতি রক্ত-কণিকায়!" ......

তারপর এই যে হিন্দুস্থানের অলিতে গলিতে কমলিওয়ালে সেজে ফিরে এলুম, সে তো শুধু ঐ এক ব্যথার সান্ত্বনাটা বুকে চেপেই। ভাবতুম, এমনি করে ঘুরে-ঘুরেই আমার জনম কাটবে, কিন্তু তা আর হ'ল কই? আবার সেই গোলেস্তানে ফিরে এলুম। সেখানে আমার মাটির কুঁড়ে মাটিতে মিশিয়ে গিয়েছে, কিন্তু তারই আর্দ্র বুকে যে তোমার ঐ পদচিহ্ন আঁকা র'য়েছে,... তাই আমায় জানিয়ে দিলে, যে, তুমি এখানে আমায় খুঁজতে এসে না পেয়ে শুধু কেঁদে ফিরেছ।

সেই পাগলটা আবার এসে জানিয়ে দিয়ে গেল যে, তুমি চমনে ফুটে শুকিয়ে যাচ্ছ।

আমি এসেই তোমায় দূর হ'তে দেখে চিনেছি। তবে তুমি আমায় দেখে অমন করে ছুটে পাল্যালে কেন? সে কি মাতালের মত টলতে টলতে দৌড়ে লুকিয়ে পড়লে ঐ খোর্মা গাছগুলোর আড়ালে! সে কি অসম্বৃত অশ্রু ঝরে প'ড়ছিল তোমার! আর কতই যে ব্যথিত অনুযোগ ভ'রে উঠেছিল সে করুণ দৃষ্টিতে।

কিন্তু কোথা গেলে তুমি? বেদৌরা, তুমি কোথায়?. . . . .

বেদৌরার কথা

বোস্তান

মা গো, কি ব্যথিত পাণ্ডুর আকাশ! এই যে এত বৃষ্টি হ'য়ে গেল, ও অসীম আকাশের কান্না নয় তো?— না না, এত উদার যে, সে কাঁদবে কেন? আর কাঁদলেও তার অশ্রু আমাদের সঙ্কীর্ণ পাপ-পঙ্কিল চোখের জলের মতো বিস্বাদ আর উষ্ণ নয় তো! দেখছ, সে কত ঠাণ্ডা!...........

কিন্তু আমি কি স্বপ্ন দেখছি? একেবারে এক দৌড়ে চমন থেকে এই বোস্তানে এসেছি! তা হোক্, এতক্ষণে যেন জানটা ধড়ে এল। ....আ ম'লো! এত হুঁকরে হুঁকরে বুক ফেটে কান্না আসছে কিসের? মানুষের মনের মত আর বালাই নেই!

ঐ জ্বালাতেই তো আমায় জ্বালিয়ে খেলে গো! কি? তার দেখা পেয়েছি বলে এ কান্না?—তাতে আর হয়েছে কি?

সে যে ফিরে আসবেই, সে তো জানা কথা। কিন্তু এত দিনে কেন? এ অসময়ে কেন? এখন যে আমার মালতী লতা রিক্তকুসুম! ওগো এ মরণের তটে এ দুর্দিনে কি দিয়ে বাসর সাজাব? যদি এলেই, তবে কেন দু'দিন আগেই এলে না? তা হ'লে তো তোমায় এমন করে এড়িয়ে চ'লতে না! সেই দিনই—যেদিন আমার ঐ চমনের শুকনো বাগানের ধারে তোমায় দেখতে পেয়েছিলাম—সেই দিনই তোমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ব'লতাম,—"এস প্রিয়, ফিরে এস!"

আমরা নারী, একটুতেই যত কেঁদে ভাসিয়ে দিতে পারি, পুরুষরা তা তো পারে না। তাদের বুকে যেন সব সময়েই কিসের পাথর চাপা। তাই যখন অনেক বেদনায় এই সংযমী পুরুষদের দু'টি ফোঁটা অসম্বরণীয় অশ্রু গড়িয়ে পড়ে, তখন তা দেখে না কেঁদে থাকতে পারে, এমন নারী তো আমি দেখি না!

সেদিন যখন কত বছর পরে আমাদের চোখাচোখি হ'ল, তখন কত মিনতি অনুযোগ আর অভিমান মূর্ত হ'য়ে ফুটে উঠেছিল আমাদের চারটি চোখেরই সজল চাউনিতে!—হ্যাঁ, আর কেমন—বেদৌরা ব'লে মাথা ঘুরিয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে ঐ খেজুরের কাঁটা-ঝোপটায় প'ড়ে গেল। তা দেখে পাষাণী আমি কি ক'রেই সে চোখ দু'টো জোর করে দু'-হাত দিয়ে চেপে এত দূর যেন কোন্ অন্ধ অমানুষিক শক্তির বলে ছুটে এলাম।

পুরানো কত স্মৃতিই আজ আমার বুক ছেপে উঠছে। সেই গোলেস্তানে এক জোড়া বুলবুলেরই মত মিলনেই অভিমান, মিলনেই বিচ্ছেদ-ব্যথা আর তারই প্রগাঢ় আনন্দে অজস্র অশ্রুপাত! তার চিন্তাটাও কত ব্যথিত-বিধুর! তারপর সেই জুয়াচোরের জোর ক'রে আমায় ছিনিয়ে-নেওয়া দয়িতের বুক থেকে,—অনেক কষ্টে তার হাত এড়িয়ে প্রিয়ের অন্বেষণ!—ওঃ, কি-ই না ক'রেছে তাকে আবার পেতে! কই, তখনও তো সে এল না!

তার পর ভিতরে বাইরে সে কি দ্বন্দ্ব লেগে গেল! ভিতরে ঐ এক তূষের আগুন ধিকি-ধিকি জ্ব'লতে লাগল, আর বাইরে? বাইরে ফাগুনের উদাস বাতাস প্রাণে কামনার তীব্র আগুন জ্বালিয়ে দিলে! ঠিক সেই সময় কোথা থেকে ধূমকেতুর মত সয়ফুল্-মুলুক এসে আমায় কান-ভাঙানি দিলে— ভালবাসায় কি বিরাট শান্ত স্নিগ্ধতা আর করুণ গাম্ভীর্য, ঠিক ভৈরবী রাগিনীর কড়ি মধ্যমের মত! আর এই বিশ্রী কামনাটা কত তীব্র—তীক্ষ্ণ—নির্মম! এই বাসনার ভোগে যে সুখ, সে হ'চ্ছে পৈশাচিক সুখ! এতে শুধু দীপক রাগিনীর মত পুড়িয়েই দিয়ে যায় আমাদের! অথচ এই দীপকের আগুন একবার জ্বলে উঠবেই আমাদের জীবনের নব-ফাল্গুনে। সেই সময় স্নিগ্ধ মেঘ-মল্লারের মত সান্ত্বনার একটা-কিছু পাশে না থাকলে সে যে জ্ব'লবেই—দীপক যে তাকে জ্বালাবেই!

তাই তো যে দিন পুষ্পিত যৌবনের ভারে আমি ঢ'লে ঢ'লে প'ড়ছিলাম, আর একজন এসে আমায় যাঞ্চা ক'রলে, তখন আমার এই বাইরের প্রবৃত্তিটা দমন

করবার ক্ষমতাই যে রইল না। তখন যে আমি অন্ধ। ওগো দেবতা, সে-দিন তুমি কোথায় ছিলে! কেউ যে এল না শাসন ক'রতে তখন! হায়, সেই দিনই আমার মৃত্যু হ'ল! সেই দিনই আমি ভিখারিণী হয়ে পথে ব'সলাম। ওগো, আমার সেই অধঃপতনের দিনে চোখে যে পুঞ্জীভূত অন্ধকারের নিবিড় কালিমা একেবারে ঘন-জমাট হ'য়ে ব'সেছিল, তখন এখনকার মত এতটুকুও আলোক যে সে-অন্ধকারটাকে তাড়াতে চেষ্টা করেনি। হয়তো একটি রশ্মিরেখার ঈষৎপাতে সব অন্ধকার সে দিন ছুটে পালাত! তা হ'লে দেখতে গো, কে আমার সমস্ত হৃদয়-আসন জুড়ে রাজাধিরাজ একছত্র সম্রাটের মত ব'সে আছে।

তবু যে আমার এ অধঃপতন হ'ল, তা সে-দিনও বুঝতে পারিনি, আজও বুঝতে পারছি নে, কেমন যেন সব গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে! কিন্তু আমি যদি বলি, আমার প্রেম—বক্ষের গভীর গোপন-তলে-নিহিত মহান প্রেম, যা সর্বদাই পবিত্র, তা তেমনি পূত অনবদ্য আছে আর চিরকালই থাকবে, তার গায়ে আঁচড় কাটে বাইরের কোন অত্যাচার-অনাচারের এমন ক্ষমতা নেই,—তা হ'লে কে বুঝবে? কেই বা আমায় ক্ষমা ক'রবে? তবু আমি ব'লব, প্রেম চিরকালই পবিত্র, দুর্জয়, অমর; পাপ চিরকালই কলুষ, দুর্বল আর ক্ষণস্থায়ী।

ওঃ—মা! কি অসহ্য বেদনা এই সারা বুকের পাঁজরে পাঁজরে!....... কি সব ভুল ব'কছিলাম এতক্ষণ! ঠিক যেন খোওয়াব দেখছিলাম, না?..পাপ ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু নদীর বান-ভাসির পর যেমন বান রেখে যায় একটা পলির আবরণ সারা নদীটার বুকে, তেমনি পাপ রেখে যায় সঙ্কোচের পুরু একটা পর্দা; সেটা কিন্তু ক্ষণস্থায়ী নয়, সেটা হয়তো অনেকেরই সারা জীবন ধরে থাকে। পাপী নিজেকে সামলে নিয়ে হাজার ভাল ক'রে চ'ললেও ভাবে, আমার এ দুর্নাম তো সারা জীবন কাদা-লেপ্টা হ'য়ে লেগেই থাকবে! চাঁদের কলঙ্ক পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাও যে ঢাকতে পারে না! এই পাপের অনুশোচনাটাও কত বিষাক্ত—তীক্ষ্ণ! ঠিক যেন একসঙ্গে হাজার হাজার ছুঁচ বিঁধছে বুকের প্রতি কোমল জায়গায়। ....

আবার আমার মনে প'ড়েছে সেই আমার বিপথে-টেনে-নেওয়া শয়তান সয়ফুল-মুলকের কথা। সে-ই তো যত 'নষ্ট গুড়ের খাজা'। এখন তাকে পেলে নখ দিয়ে ছিঁড়ে ফেলতাম!

আমরা নারী,—মনে করি, এতটুকুতেই আমাদের হৃদয় অপবিত্র হ'য়ে গেল, আর অনুশোচনায় মনে মনে পুড়ে মরি। আমরা আরও ভাবি যে, হয়তো পুরুষদের অত সামান্যতে পাপ স্পর্শে না। আর তাদের মনে এত তীব্র অনুশোচনাও জাগে না। কিন্তু সেই যে সে-দিন, যে-দিন আমার বাসনার পিয়াস শুকিয়ে গিয়েছে, আর মধু ভেবে আকণ্ঠ হলাহল পানের তীব্র জ্বালায় ছটফট ক'রছি, আর ঠিক সেই সময় সহসা বিরাট বিপুল হ'য়ে আমার ভিতরের প্রেমের পবিত্রতা অপ্রতিহত তেজে জেগে উঠেছে—সে তেজ চোখ দিয়ে ঠিকরে বেরুচ্ছে—সে দিন—ঠিক সেই দিন সয়ফুল্-মুলক্ সহসা কি রকম ছোট হ'য়ে গেল! একটা দুর্বার ঘৃণামিশ্রিত লজ্জার কালিমা তার মুখটাকে কেমন বিকৃত

ক'রে দিলে। সে দূর থেকে কেমন আমার দিকে একটা ভীত চকিত দৃষ্টি ফেলে উপর দিকে দু'হাত তুলে আর্তনাদ করে উঠল, "খোদা! আমি জীবন দিয়ে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রব। তবে যেন, সে-জীবন মঙ্গলার্থেই দিতে পারি, শুধু এইটুকু ক'রো খোদা!'

তার পর কেমন সে উন্মাদের মত ছুটে এসে আমার পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে ব'ললে,— "দেবী, ক্ষমা ক'রো এ শয়তানকে! দেবীর দেবীত্ব চিরকালই অটুট থাকে,বাইরের কলঙ্কে তা কলঙ্কিত হয় না, বরং সংঘর্ষের ফলে তা আরো মহান উজ্জ্বল হ'য়ে যায়! কিন্তু আমি?— আমি? ওঃ ওঃ ওঃ!" সে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। তার সে-ছোটা থেমেছে কি না জানি নে।

কিন্তু এ কি! আবার আমার মনটা কেন আমাকে যেন ভাঙানি দিচ্ছে শুধু একবার দেখে আসতে যে, তিনি তেমনি করেই সেই খেজুর-কাঁটার ঝোপে বেহুঁশ হ'য়ে প'ড়ে আছেন কি না। . . . . . না ,না,— এ প্রাণ-পোড়ানি আর সইতে পারি নে গো— আর সইতে পারি নে! হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রবই ক'রব, একবার শেষ দেখা; তার পর ব'লব তাঁকে,— ওগো, তোমার সে বেদৌরা আর নেই— সে ম'রেছে, ম'রেছে। তার প্রাণ তোমারই সন্ধানে বেরিয়ে গিয়েছে। তুমি তাকে বৃথা এমন করে খুঁজে বেড়াচ্ছ! বেদৌরা নেই— নেই— নেই।

তার পর— তার পর? তার পরেও তিনি আমায় চান, তা হ'লে কি ব'লব তাঁকে, কি ক'রব তখন?— না, তখনও এমনি শক্ত কাঠ হ'য়ে ব'লব,— ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না গো দেবতা, ছুঁয়ো না। আমার এ অপবিত্র দেহ ছুঁয়ে তোমার পবিত্রতার অবমাননা ক'রো না।

আঃ! মা গো! কি ব্যথা! বুকের ভিতরটা কে যেন ছুরি হেনে খান্ খান্ ক'রে কেটে দিচ্ছে।।

দারার কথা

গোলেস্তান

তুমি কি সেই গোলেস্তান ? তবে আজ তুমি এত বিশ্রী কেন? তোমার ফুলে সে সৌন্দর্য নেই, শুধু তাতে নরকের নাড়ি উঠে-আসা পূতিগন্ধ! তোমার আকাশ আর তেমন উদার নয়, কে যেন তাকে পঙ্কিল ঘোলাটে ক'রে দিয়েছে! তোমার মলয় বাতাসে যেন লক্ষ হাজার কাচের টুক্‌রো লুকিয়ে রয়েছে! আমার সারা গায়ে যেন বেদনা! . . . . .

কি ক'রলে বেদৌরা তুমি? বেদৌরা!— নাঃ, এই যে ব্যথা দিলে তুমি,— এই যে প্রাণ-প্রিয়তমের কাছ থেকে পাওয়া নিদারুণ আঘাত, এতেও নিশ্চয়ই খোদার মঙ্গলেচ্ছা নিহিত আছে। আমি কখনই ভুলব না খোদা, যে, তুমি নিশ্চয় মহান, আর তোমার-দেওয়া সুখ-দুঃখ সব সমান ও মঙ্গলময়! তোমার কাজে অমঙ্গল থাকতে পারে না, আর তুমি ছাড়া ভবিষ্যতের খবর কেউ জানে না। ব্যথিতের বুকে এই সান্ত্বনা কি শান্তিময়!

আচ্ছা, তবু মন মানছে কই? কেন ভাবছি, এ নিশ্চয়ই আঘাত। তৃষাতুর চাতক যখন "ফটিক জল— ফটিক জল" করে কেঁদে কেঁদে মেঘের কাছে এসে পৌঁছে, আর নিদারুণ মেঘ তার বুকে বজ্র হেনে দিয়ে বিদ্যুৎ-হাসি হাসে, তখন কেন মনে করি, এ মেঘের বড়ই নিষ্ঠুরতা? — কেন?

কিন্তু এত দিনেও নিজের স্বরূপ জানতে পারলুম না। আগে মনে ক'রতুম, আমি কত বড়— কত উচ্চ। আজ দেখছি, সাধারণ মানুষের চেয়ে আমি একরত্তিও বড় নই। আমারও মন তাদের মত অমনি সঙ্কীর্ণতা আর নীচতায় ভরা। নৈলে আমি বেদৌরার এ দোষ সরল মনে ক্ষমা ক'রতে পারলুম না কেন? হোক না কেন যতই বড় সে দোষ। বাহিরটা তার নষ্ট হ'য়েছে বটে, কিন্তু ভিতরটা যে তেমনি পবিত্র আর শুভ্র র'য়েছে। অনেকে যে ভিতরটা অপবিত্র ক'রে বাহিরটা পবিত্র রাখবার চেষ্টা করে, সেইটাই হ'চ্ছে বড় দোষ কিন্তু এই যে বেদৌরার সহজ সরলতায় তার ভিতরটা পবিত্র রয়েছে জেনেও তাকে প্রাণ খুলে ক্ষমা ক'রতে পারলুম না, সে দোষ তো আমারই; কেননা আমি এখনও অনেক ছোট। জোর ক'রে বড় হবার জন্যে একবার ক্ষমা ক'রতে ইচ্ছে হ'য়েছিল বটে, কিন্তু তা তো হ'তে পারে না। সে যে হৃদয় হ'তে নয়। —নাঃ আমাকে পুড়ে খাঁটি হ'তে হবে। খুব দূরে থেকে যদি মনটাকে ঠিক ক'রতে পারি, তবেই আবার ফিরব, নইলে নয়। ওঃ, কি নীচ আমি! প্রথমে বেদৌরার মুখ থেকে তার এই পতনের কথা শুনে আমি তো একেবারে নরক-কুন্ডে গিয়ে পৌঁছেছিলুম। মনে ক'রেছিলুম, আমি এমনি ক'রে সুপ্ত কামনায় ঘৃতাহুতি দিয়ে বেদৌরার ওপর শোধ নেব। তার পর নরকের দ্বার থেকে কেমন ক'রে হাত ধ'রে অশ্রু মুছিয়ে আমায় কে যেন ফিরিয়ে আনলে। সে বেশ শান্ত স্বরেই ব'ললে,— "এ প্রতিশোধ তো বেদৌরার ওপর নয় ভাই, এ প্রতিশোধ তোমার নিজের ওপর।" ভাবলুম, তাই তো, অভিমানের ব্যথায় ব্যথিত হ'য়ে এ কি আত্মহত্যা ক'রতে যাচ্ছিলুম? আমি আবার ফিরলুম।

তার পর বেদৌরাকে ব'লে এলুম— "বেদৌরা! যদি কোন দিন হৃদয় হ'তে ক্ষমা করবার ক্ষমতা হয়, তবেই আবার দেখা হবে, নইলে এই আমাদের চির বিদায়! মুখ জোর ক'রে ক্ষমা ক'রলুম ব'লে তোমায় গ্রহণ ক'রে আমি তো একটা মিথ্যাকে বরণ ক'রে নিতে পারি নে। আমি চাই, প্রেমের অঞ্জন আমার এই মনের কালিমা মুছিয়ে দিক।"

বেদৌরা-অশ্রু-ভরা হাসি হেসে ব'ললে,— "ফিরতেই হবে প্রিয়তম, ফিরতেই যে হবে তোমায়! এ সংশয় দু'-দিনেই কেটে যাবে। তখন দেখবে, আমাদের সেই ভালবাসা কেমন ধৌত শুভ্র বেশে আরও গাঢ় পূত হ'য়ে দেখা দিয়েছে! আমি তোমারই প্রতীক্ষায় গোলেস্তানের এই ক্ষীণ ঝরণাটার ধারে ব'সে গান আর মালা গাঁথব। আর তা যে তোমায় প'রতেই হবে। ব্যথার পূজা ব্যর্থ হবার নয় প্রিয়! ..."

কোথায় যাই এখন, আর সে কোন পথে? ওগো আমার পথের চিরসাথি, কোথায় তুমি?

* * *

আমি সেই শয়তান, আমি সেই পাপী, যে এক দেবীকে বিপথে চালিয়েছিল। ভাবলুম, এই ভুবনব্যাপী যুদ্ধে যে-কোনো দিকে যোগ দিয়ে যত শীগ্‌গীর পারি এই পাপ-জীবনের অবসান ক'রে দিই। তার পর? তার পর আর কি? যা সব পাপীদের হয়, আমারও হবে।

পাপী যদি সাজা পায়, তা হ'লে সে এই ব'লে শান্তি পায় যে, তার ওপর অবিচার করা হ'চ্ছে না, এই শাস্তিই যে তার প্রাপ্য। কিন্তু শাস্তি না পেলে ভিতরের বিবেকের যে দংশন, তা নরক-যন্ত্রণার চেয়ে অনেক বেশি ভয়ানক।

যা ভাবলুম, তা আর হ'ল কই! ঘুরতে ঘুরতে শেষে এই মুক্তিসেবক সৈন্যদের দলে যোগ দিলুম। এ পরদেশীকে তাদের দলে আসতে দেখে এই সৈন্যদল খুব উৎফুল্ল হয়েছে। এরা মনে করছে, এদের এ মহান নিঃস্বার্থ ইচ্ছা বিশ্বের অন্তরে অন্তরে শক্তি সঞ্চয় ক'রছে। আমায় আদর ক'রে এদের দলে নিয়ে এরা বুঝিয়ে দিলে যে, কত মহাপ্রাণিত আর পবিত্র নিঃস্বার্থপরতা-প্রণোদিত হ'য়ে তারা উৎপীড়িত বিশ্ববাসীর পক্ষ নিয়ে অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রছে এবং আমিও সেই মহান ব্যক্তিসংঘের একজন। আমার কালো বুকে অনেকটা তৃপ্তির আলোক পেলুম।

খোদা, আজ আমি বুঝতে পারলুম, পাপীকে তুমি ঘৃণা কর না, দয়া কর। তার জন্যেও সব পথই খোলা রেখে দিয়েছ। পাপীর জীবনেরও দরকার আছে। তা দিয়েও মঙ্গলের সলতে জ্বালানো যায়। সে ঘৃণ্য অস্পৃশ্য নয়।

কিন্তু সহসা এ কি দেখলুম! দারা কোথা থেকে এখানে এল? সে-দিন তাকে অনেক ক'রে জিজ্ঞেস করায় সে ব'ললে, — "এর চেয়েও ভাল কাজ আর দুনিয়ায় খুঁজে পেলুম, না তাই এ দলে এসেছি।"

আঘাত খেয়ে খেয়ে কত বিরাট গম্ভীর হ'য়ে গিয়েছে সে! আমাকে ক্ষমা চাইতেই হবে যে এই বেদনাতুর যুবকের কাছে; নইলে আমার কোথাও ক্ষমা নেই। এর প্রাণে এই ব্যথার আগুন জ্বালিয়েছি তো আমিই, একে গৃহহীন ক'রেছি তো আমিই।

কি অচিন্ত্য অপূর্ব অসম সাহসিকতা নিয়ে যুদ্ধ ক'রছে দারা! সবাই ভাবছে এত অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রাণের প্রতি ভ্রুক্ষেপও না ক'রে বিশ্ববাসীর মঙ্গলের জন্যে হাসতে হাসতে যে এমন করে বুকের রক্ত দিচ্ছে, সে বাস্তবিকই বীর, আর তাদের জাতিও বীরের জাতি। এমন দিন নেই, যে-দিন একটা না একটা আঘাত আর চোট না খেয়েছে সে। সে দিকে কিন্তু দৃষ্টিই নেই তার। সে যেন অগাধ অসীম এক যুদ্ধ পিপাসা নিয়ে প্রচন্ড বেগে মৃত্যুর মত কঠোর হ'য়ে অন্যায়কে আক্রমণ ক'রছে। যতক্ষণ এতটুকুও জ্ঞান থাকে তার, ততক্ষণ কার সাধ্য তাকে যুদ্ধস্থল

থেকে ফেরায়? কি একরোখা জিদ! আমি কিন্তু বুঝতে পারছি, এ সংগ্রাম তার বাইরের জন্যে নয়, এ যে ভিতরের ব্যথার বিরুদ্ধে ব্যর্থ অভিযান। আমি জানি, হয় এর ফল অতি বিষময়, নতুবা খুবই শান্ত-সুন্দর।

ক'দিন থেকে বোমা আর উড়োজাহাজ হ'য়েছে এর সঙ্গী। বাইরে ভিতরে এত আঘাত এত বেদনা অম্লান বদনে সহ্য ক'রে কি ক'রে একাদিক্রমে যুদ্ধ জয় ক'রছে এই উম্মাদ যুবক? ভয়টাকে যেন আরব সাগরে বিসর্জন দিয়ে এসেছে।

আজ সে একজন সেনাপতি। কিন্তু এ কি অতৃপ্তি এখনও তার মুখে বুকে জাগছে! রোজই জখম হ'চ্ছে, কিন্তু তাকে হাসপাতালে পাঠায় কার সাধ্য? গোলন্দাজ সৈনিককে ঘুমাবার ছুটি দিয়ে ভাঙা-হাতেই সে কামান দাগছে। সেনাপতি হ'লেও সাধারণ সৈনিকের মত তার হাতে গ্রেনেডের আর বোমার থলি, পিঠে তরল আগুনের বালতি, আর হাতে রিভলভার তো আছেই। রক্ত বইয়ে, লোককে হত্যা ক'রে তার যে কি আনন্দ, সে আর কি ব'লব! সে ব'লছে, পরাধীন লোক যত কমে, ততই মঙ্গল।

আমি আবাক হচ্ছি, এ সত্যি-সত্যিই পাগল হয়ে যায়নি তো!

* * *

একি ক'রলে খোদা! এ কি ক'রলে! এত আঘাতের পরেও হতভাগা দারাকে অন্ধ আর বধির ক'রে দিলে? এই পৈশাচিক যুদ্ধ-তৃষ্ণার ফলে যে এই রকমই কিছু একটা হবে, তা আমি অনেক আগে থেকেই ভয় করছিলাম! আচ্ছা, করুণাময়, তোমার লীলা আমরা বুঝতে পারি নে বটে, কিন্তু এই যে নিরপরাধ যুবকের চোখ দুটো বোমার আগুনে অন্ধ আর কান দুটো বধির ক'রে দিলে, আর আমার মত পাপী শয়তানের গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগল না, এতেও কি ব'লব যে, তোমার মঙ্গল-ইচ্ছে লুকানো র'য়েছে? কি সে মঙ্গল, এ অন্ধকে দেখাও প্রভু, দেখাও! এ অন্ধের দাঁড়াবার যষ্টিও যে ভেঙে দিয়েছি , আমি! তবে কি আমার বাহিরটা অক্ষত রেখে ভিতরটাকে এমনি ছিন্ন-ভিন্ন আর ক্ষত-বিক্ষত ক'রতে থাকবে? ওগো ন্যায়ের কর্তা! এই কি আমার দন্ড, —এই বিশ্বব্যাপী অশান্তি?

* * *

আজ আমাদের ঈপ্সিত এই প্রধান জয়োল্লাসের দিনেও আমাদের জয়পাতাকাটা রাজ অট্টালিকার শিরে থর্‌ থর্‌ ক'রে কাঁপছে। বিজয়-ভেরীতে জয়নাদের পরিবর্তে যেন জান-মোচড়ানো শ্রান্ত "ওয়ালট্‌জ"-রাগিণীর আর্ত সুর হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বেরুচ্ছে। তূর্য বাদকের স্বর ঘন ঘন ভেঙে যাচ্ছে! আজ অন্ধ সেনানী দারার বিদায়ের দিন। অন্ধ বধির আহত দারা যখন আমার কাঁধে ভর ক'রে সৈনিকদের সামনে দাঁড়াল, তখন সমস্ত মুক্তিসেবক সেনার নয়ন দিয়ে হু-হু ক'রে অশ্রুর বন্যা ছুটেছে। আমাদের কঠোর সৈনিকদের কান্না যে কত মর্মন্তুদ, তা বোঝাবার ভাষা নেই। মুক্তিসেবক সৈন্যাধ্যক্ষ ব'ললেন —তাঁর স্বর বারংবার অশ্রুজড়িত হ'য়ে যাচ্ছিল,— "ভাই দারাবী! আমাদের মধ্যে ভিক্টোরিয়া ক্রস, মিলিটারী ক্রস প্রভৃতি পুরস্কার দেওয়া হয় না, কেন না আমরা নিজে নিজেই তো

আমাদের কাজকে পুরস্কৃত ক'রতে পারি নে। আমাদের বীরত্বের ত্যাগের পুরস্কার বিশ্ববাসীর কল্যাণ; কিন্তু যারা তোমার মত এই রকম বীরত্ব আর পবিত্র নিঃস্বার্থ ত্যাগ দেখায় আমরা শুধু তাদেরই বীর বলি। "

সৈন্যাধ্যক্ষ পুনরায় ঢোক গিলে আর কোটের আস্তিনে তাঁর অবাধ্য অশ্রু-ফোঁটা ক'টি মুছে নিয়ে ব'ললেন, — "তুমি অন্ধ হ'য়েছ, তুমি বধির হ'য়েছ, তোমার সারা অঙ্গে জখমের কাঠোর চিহ্ন, — আমরা ব'লব, এই তোমার বীরত্বের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার! অনাহুত তুমি বিশ্বের মঙ্গল কামনায় প্রাণ দিতে এসেছিলে, তার বিনিময়ে খোদা নিজ হাতে যা দিয়েছেন, — হোক না কেন তা বাইরের চোখে নির্মম— তার বড় পুরস্কার, মানুষ আমরা কি দেব ভাই? "খোদা নিশ্চয়ই মহান এবং তিনি ভাল কাজের জন্যে লোকদের পুরস্কৃত করেন" — এ যে তোমাদেরই পবিত্র কোরআনের বাণী। অতএব হে বীর সেনানী, হয়তো তোমার এই অন্ধত্ব ও বধিরতার বুকেই সব শান্তি সব সুখ সুপ্ত র'য়েছে। খোদা তোমায় শান্তি দিন।"

দারা তার দৃষ্টিহীন চোখ দু'টি নিয়ে যতদূর সাধ্য সৈনিকগণকে দেখবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে অশ্রুচাপা কণ্ঠে শুধু বলতে পেরেছিল,-'বিদায়, পবিত্র বীর ভাইরা আমার! "

আমিও অন্ধ দারার সঙ্গে আবার এই গোলেস্তানেই এলাম। আর এই তো আমার ব্যর্থ জীবনের সান্ত্বনা, এই নির্বিকার বীরের সেবা। দারা আমায় ক্ষমা ক'রেছে, আমায় সখা বলে কোল দিয়েছে। এতদিনে না এই হতভাগ্য যুবকের রিক্ত জীবন সার্থকতার পুষ্পে পুষ্পিত হ'য়ে উঠল। এতদিনে না সত্যিকার ভালবাসায় তাকে ঐ অসীম আকাশের মতই অনন্ত উদার ক'রে দিলে! রাস্তায় আসতে আসতে তাকে জিজ্ঞেস ক'রলাম, — "আচ্ছা ভাই, তুমি বেদৌরাকে ক্ষমা করেছ?'

সে কান্না-ভরা হাসি হেসে সাধকশ্রেষ্ঠ প্রেমিক রুমীর এই গজলটা গাইলে, —

> "ওগো প্রিয়তম, তুমি যত বেদনার শিলা দিয়ে
> আমার বুকে আঘাত ক'রেছ, আমি তাই দিয়ে যে
> প্রেমের মহান মসজিদ তৈরি ক'রেছি। "

আমার বিশ্বাস, শিশুদের চে'য়ে সরল আর কিছুই নেই দুনিয়ায়। দারাও প্রেমের মহিমায় যেন অমনি সরল শিশু হ'য়ে প'ড়েছে। তার মুখে কেমন সহজ হাসি, আবার কেমন অসঙ্কোচ কান্না! তা কিন্তু অতি বড় পাষাণকেও কাঁদায়। আমি সে- দিন হাসতে হাসতে বললাম, —হ্যাঁ ভাই, এই যে তুমি অন্ধ আর বধির হ'য়ে গেলে, এতে মঙ্গলময়ের কোন মঙ্গলের আভাস পাচ্ছ কি? "

সে ব'ললে, — "ওরে বোকা, এই যে তোদের আজ ক্ষমা ক'রতে পেরেছি— এই যে আমার মনের সব গ্লানি সব ক্লেদ ধুয়ে–মুছে সাফ হ'য়ে গিয়েছে, সে এই অন্ধ হ'য়েছি ব'লেই তো, — এই বাইরের চোখ দুটোকে কানা ক'রে আর শ্রবণ

দুটোকে বধির করেই তো! অন্ধেরও একটা দৃষ্টি আছে, সে হ'চ্ছে অর্ন্তদৃষ্টি বা অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি। এখন আমি দেখছি দুনিয়া-ভরা শুধু প্রিয়ার রূপ আর তারই হাসির অনন্ত আলো। আর এই কালা কান দুটো দিয়ে কি শুনছি জানিস? শুধু তার কানে কানে বলা গোপন প্রেমালাপের মঞ্জু গুঞ্জন আর চরণ-ভরা মঞ্জীরের রুণু-ঝুনু বোল! 'আমি যে এই নিয়েই মশগুল!' —ব'লেই অভিভূত হ'য়ে সে গান ধ'রলে, —

"যদি আর কারে ভালবাস, যদি আর নাহি ফিরে আস
তবে তুমি যাহা চাও, তাই যেন পাও, আমি যত দুঃখ পাই গো!
আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই তুমি তাই গো,
তুমি ছাড়া মোর এ জগতে আর কেহ নাই কিছু নাই গো!

কানাড়া রাগিণীর কোমল গান্ধারে আর নিখাদে যেন তার সমস্ত আবিষ্ট বেদনা মূর্ত্তি ধ'রে মোচড় খেয়ে খেয়ে কেঁদে যাচ্ছিল। কিন্তু কত শান্ত-স্নিগ্ধ বিরাট নির্ভরতা আর ত্যাগ এই গানে!

সবচেয়ে আমার বেশি আশ্চর্য বোধ হ'চ্ছে যে, বেদৌরাও আমাকে ক্ষমা ক'রেছে, অথচ তার এ বলায় এতটুকু কৃত্রিমতা বা অস্বাভাবিকতা নেই। এ যেন প্রাণ হতে ক্ষমা ক'রে বলা।

খোদা, তুমি মহান! "যার কেউ নেই তুমি তার আছ। " এই প্রেমিকদের সোনার কাঠির স্পর্শে আমি- যে আমি, তারও আর কোন গ্লানি নেই, সঙ্কোচ নেই।

আজ এই বিনা কাজের আনন্দ,-ওঃ, তা কত মধুর আর সুন্দর!

বেদৌরার কথা

গোলেস্তান
(নির্ঝরের অপর পার)

তিনি আমায় ক্ষমা ক'রেছেন একেবারে প্রাণ খুলে হৃদয় হ'তে। এবার এ-ক্ষমায় এতটুকু দীনতা নেই। এ যে হবেই, তা তো আমি জানতামই, আর তাই যে এমন ক'রে আমার প্রতীক্ষায় সকাল সাঁঝগুলি আনন্দেই কেটে গিয়েছে। আমার এই আশায়-ব'সে থাকা দিনগুলো বিরলে- গাঁথা ফুলহারগুলো আর তা বেদনা বিরহ-গানগুলি তারই পায়ে ঢেলে দিয়েছি। তিনি তা গলায় তুলে নিয়ে তার বিনিময়ে যা দিয়েছেন সেই তো গো তাঁর আমায়-দেওয়া ব্যথার দান।

তিনি ব'ললেন— "বেদৌরা! কামনা আর প্রেম, এ দু'টো হ'চ্ছে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। কামনা একটা প্রবল সাময়িক উত্তেজনা আর প্রেম হ'চ্ছে ধীর প্রশান্ত ও চিরন্তন! কামনার প্রবৃত্তি বা তার নিবৃত্তিতে হৃদয়ের দাগ-কাটা ভালাবাসাকে যে ঢাকতেই পারে না, এ হ'চ্ছে ধ্রুব সত্য। এই রকম বিড়ম্বিত যে

বেচারারা এই কথাটা একটু তলিয়ে দেখে ধীরভাবে বিশ্বাস ক'রে না, তারা মস্ত ভুল ক'রে, আর তাদের মত হতভাগ্য অশান্ত জীবনও কারুর, নেই। বাদলার দিনে কালো মেঘগুলো সূর্যকে গ্রাস ক'রতে যতই চেষ্টা করুক, তা কিন্তু পারে না। তবে তাকে খানিকক্ষণের জন্যে আড়াল ক'রে থাকে মাত্র। কেননা সূর্য থাকে মেঘের নাগাল পাওয়ার অনেক দূরে। কোন ফাঁকে আর সে কেমন ক'রে যে অত মেঘের পুরু স্তর ছিঁড়ে রবির কিরণ দুনিয়ার বুকে প্রতিফলিত হয়, তা মেঘও ভেবে পায় না, আর আমরাও জানতে চেষ্টা করি নে। তারপর মেঘ কেটে গেলেই সূর্য হাসতে থাকে আরও উজ্জ্বল হ'য়ে। কারণ তাতে তো সূর্যের কোন অনিষ্টই হয় না,— সে জানে, সে যেমন আছে তেমনি অটুট থাকবেই; ক্ষতি যা তোমার আমার— এই দুনিয়ার। তাই ব'লে কি বাদলের মেঘ আসবে না? সে এসে আকাশ ছাইবে না? সে আসবেই, ওর যে স্বভাব; তাকে কেউ রুখতে পারবে না। তবে অত বাদলেও সূর্য কিরণ পেতে হলে মেঘ ছাড়িয়ে উঠতে হয়। সেটা তেমন সোজা নয় আর তা দরকারও ক'রে না। কামনাটা হ'চ্ছে ঠিক এই বাদলের মত; আর প্রেম জ্বলছে হৃদয়ে ঐ রবিরই মত একই ভাবে সমান ঔজ্জ্বল্যে।

"কামনায় হয়তো তোমার বাহিরটা নষ্ট ক'রেছে, কিন্তু ভিতরটা তো নষ্ট ক'রতে পারে নি। তা ছাড়া, ও না হ'লে যে তুমি আমাকে এত বেশি ক'রে চিনতে না, এত বড় ক'রে পেতে না। বাইরের বাতাস প্রেমের শিখা নিবাতে পারে না, আরও উজ্জ্বল ক'রে দেয়। আর আমার অন্ধত্ব ও বধিরতা? ওর জন্যে কেঁদো না বেদৌরা, এ-গুলো থাকলে তো আমি তোমায় আর পেতাম না।"

পুষ্পিত সে গাছ থেকে অশ্রুচাপা কণ্ঠে "পিয়া পিয়া" ক'রে বুলবুলগুলো উড়ে গেল।

তিনি আবার ব'ললেন,— "দেখ বেদৌরা, আজ আমাদের শেষ বাসর- শয্যা হবে। তার পর রবির উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তুমি চলে যাবে নির্ঝরটার ও-পারে, আর আমি থাকবো এপারে। এই দু'পারে থেকে আমাদের দু'জনেরই বিরহ-গীতি দুইজনকে ব্যথিয়ে তুলবে। আর ঐ ব্যথার আনন্দেই আমরা দু'জনে দু'জনকে আরও বড়-আরও বড় ক'রে পাব।"

সেই দিন থেকে আমি নির্ঝরটার এ- পারে।

আমারও অশ্রু-ভরা দীর্ঘশ্বাস হু-হু ক'রে ওঠে, যখন মৌন-বিষাদে- নীরব সন্ধ্যায় তাঁর ভারী চাপা কণ্ঠ ছেপে একটা ক্লান্ত রাগিণী ও-পার হতে কাঁদতে কাঁদতে এ পারে এসে বলে,—

"আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে দিবস গেলে করব নিবেদন,
আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন!"